রক্তাক্ত গুজরাটের স্মৃতি ফিরে এল

একের পাতার পর

ঘটনার পরদিন রান্নাঘরে কাজ করছিলেন বিলকিস, এমন সময় তাঁর এক আত্মীয়া ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেন যে তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিলকিস বানো, তাঁর পরিজন ও পড়শিরা এক-কাপড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, এমনকী চটিটা পায়ে গলানোর সময়টুকুও ছিল না তাঁদের। এর পর দিনকয়েক নিজের ১৭ জন আত্মীয়ের সাথে আশ্রয়ের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন বিলকিস। সঙ্গে তিন বছরের মেয়ে, মা, এক অন্তঃসত্ত্বা বোন, অন্য ভাইবোনেরা সহ আরও কয়েকজন। ৩ মার্চ সকালে অন্য এক গ্রামে যাবেন বলে যখন তাঁরা বেরিয়েছিলেন, দুটো জিপে বেশ কয়েকজন হামলাকারী তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সবাই বিলকিসের দীর্ঘদিনের পরিচিত এক মহল্লার বাসিন্দা। তারা খুন করে ১৪ জনকে। অসহায় বিলকিসের চোখের সামনে তাঁর তিন বছরের মেয়েকে পাথরে আছাড় মারে। মাথা থেঁতলে মারা যায় শিশুটি। তিনি অন্তঃসত্ত্বা এ কথা বলে হাতে পায়ে ধরে রেহাই চাওয়ার পরেও নরপশুরা বার বার ধর্ষণ করে বিলকিসকে, তাঁর জামাকাপড় খুলে নেয়। চেতনা হারান বিলকিস। মৃত মনে করে তাঁকে ফেলে চলে যায় হামলাকারীরা।

জ্ঞান ফেরার পর রক্তমাখা কাপড়ের টুকরোয় নগ্ন শরীর কোনক্রমে ঢেকে কাছের এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন বিলকিস। পরদিন তেষ্টায় কাতর হয়ে নিচে আদিবাসীদের একটি গ্রামে গিয়ে সাহায্য চান। আদিবাসীরাই তাঁকে আশ্রয়, খাবার দাবার ও জামাকাপড় দেন। এরপর বিলকিস নামেন এক ভয়ানক অসম যুদ্ধে।

পরদিন কাছের থানায় গিয়ে অত্যাচারের বিবরণ দেন বিলকিস। পড়াশোনা জানা না থাকায় তাঁর বক্তব্য লিখে নেয় পুলিশ, এফ আই আর-এ নিয়ে নেয় তাঁর আঙুলের ছাপ। পুলিশের কাছে আক্রমণকারীদের নাম বলেছিলেন বিলকিস। কিন্তু পুলিশ সেগুলি লেখেনি। তাই বয়ানটি পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলে পুলিশ তা অস্বীকার করেছিল। এর পর বিলকিসের স্থান হয় গোধরার একটি উদ্বাস্তু শিবিরে। সেখানে স্বামী ইয়াকুব রসুলের দেখা পান তিনি। এত কিছুর পরেও বেঁচে ছিল তাঁর গর্ভের সন্তান, যথাসময়ে জন্ম হয় তার।

পুলিশে অভিযোগ জানানোর এক বছর পর ২০০৩ সালে গুজরাটের লিমখেড়ার স্থানীয় আদালত বিলকিসের মামলাটিকে বন্ধ করে দেয়। পুলিশ এমন ভাবে মামলা সাজিয়েছিল যে পুরো জিনিসটাই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিলকিস ও তাঁর স্বামীকে পুলিশ আর কিছু সরকারি কর্মচারীর ভয় দেখানো আর খুনের হুমকি। হামলার প্রমাণ লোপাট করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ময়না তদন্ত না করেই মৃতদেহগুলি কবর দেওয়া হয়েছিল। দু'জন ডাক্তারকে দিয়ে পুলিশ লিখিয়ে নিয়েছিল যে বিলকিসকে ধর্ষণ করা হয়নি।

এ সব ঘটনা যে বিচ্ছিন্ন নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পরে প্রত্যক্ষদর্শী ও সাংবাদিকদের অসংখ্য রিপোর্টে, বহু তদন্তে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ২০০২-এর সেই সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞের পরিচালক ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রশাসন যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের নির্দেশে চলেছিল হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের বাঁচানোর প্রশাসনিক অপচেষ্টা। বাস্তবে এটি যে ছিল একটি সংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রিপোর্ট থেকে এ কথা আজ সকলেরই জানা যে, গোধরা ঘটনার পরদিন সকাল থেকেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শহর ও গ্রামগুলিতে সশস্ত্র হামলা শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রমণকারীরা ছিল বহিরাগত। ভোটার তালিকা হাতে দলবদ্ধভাবে এসে বেছে বেছে তারা মুসলমান নাগরিকদের বাড়ি, দোকান, গরিব মুটে-মজুরদের বস্তি, শ্রমিক মহল্লা, পাড়া এমনকী ধর্মস্থানে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছে। উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাবাজরা এভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে এর পিছনে শুধু পূর্ব পরিকল্পনা ছিল তাই নয়, তাকে বাস্তবে কার্যকর করেছে নেতৃত্ব ও তার নির্দেশ।

এই নেতৃত্ব যে বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের কাছ থেকে এসেছিল, তাও অসংখ্য রিপোর্টে স্পষ্ট। গণহত্যা শুরু হওয়ার পর তৎকালীন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুধু যে তা সমর্থন করেছেন তাই নয়, তাঁর সরকারের মন্ত্রীরা পুলিশ কন্ট্রোলরুমে বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য করেছেন। যে পুলিশ অফিসাররা এই বর্বর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন বা তাণ্ডবকারীদের পাকড়াও করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁদের বদলি করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুললে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সব ঠিক চলছে। যা দেখছেন শুনছেন, এসবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এটা দাঙ্গা নয়, গণবিক্ষোভ' (গণদাবী, ৫৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা)। বাস্তবিকই ওই ঘটনা দাঙ্গা ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের মদতে উন্মত্ত উগ্র হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজদের সংখ্যালঘু হত্যা। মৃত্যু হয়েছিল হাজারেরও বেশি মানুষের। ৬০ হাজারের বেশি মানুষকে ঘরবাড়ি হারিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল উদ্বাস্তু শিবিরে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল।

আবার ফিরে আসা যাক বিলকিস বানোর অসম যুদ্ধের কাহিনিতে। ২০০৩ সালে স্থানীয় আদালত তাঁর মামলা 'ক্লোজ' করে দিলে বিলকিস জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হন এবং সেই সূত্রে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে যায়। বিলকিসকে চাপে ফেলতে শুরু হয়ে যায় তাঁর পরিবারের ওপর গুজরাট পুলিশের হয়রানি ও হুমকি। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে শীর্ষ আদালত গুজরাটের বিজেপি সরকার ও পুলিশের ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে সিবিআই-কে নির্দেশ দেয় মামলাটি নিয়ে তদন্ত করতে। ২০০৪-এর মে মাসে সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়, যে রিপোর্টে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুজরাট সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। সিবিআই-এর পরামর্শ মেনে সুপ্রিম কোর্ট বিলকিস বানোর মামলার বিচার গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে সরিয়ে আনে। ২০০৮-এর জানুয়ারিতে আদালত ১৩ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করলেও অভিযুক্ত দুই ডাক্তার ও পাঁচ পুলিশ অফিসারকে নির্দোষ ঘোষণা করে। পরে বম্বে হাইকোর্ট সেই রায় পরিবর্তন করে ২০১৭ সালে ১১ জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় এবং ডাক্তার ও পুলিশ অফিসারদেরও দোষী বলে ঘোষণা করে। বিলকিস বানোকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয় কোর্ট। এর বিরুদ্ধে আবার সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন বিলকিস যার ভিত্তিতে গত ২৪ এপ্রিল আদালত গুজরাট সরকারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সুবিধা তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

গুজরাট নিধনযজ্ঞ (ফাইল চিত্র)

এই দীর্ঘ ও কঠিন লড়াইয়ে বিলকিসকে সব রকমে সাহায্য করেছেন যে আইনজীবী, তিনি মন্তব্য করেছেন, শুধু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে নয়, এই লড়াই ছিল খোদ সরকার আর প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। তিনি বলেছেন, গত ১৭ বছর ধরে আক্রান্তের পাশে দাঁড়ানো দূরের কথা, গুজরাট সরকার সমানে চেষ্টা করে গেছে দুষ্কৃতীদের আড়াল করার। পুলিশ বিলকিসের অভিযোগকে প্রথম দিকে আমলই দিতে চায়নি, বার বার চেষ্টা করেছে যাতে এফআইআর-এর বয়ান বদল করা যায়। এমনকী ঘটনাস্থল বদলে ফেলারও চক্রান্ত চালিয়ে গিয়েছে গুজরাট পুলিশ। সরকারি উকিল ক্রমাগত তারিখ নেওয়ার কৌশল চালিয়ে গেছেন। এর সঙ্গে ছিল বিলকিস ও তাঁর স্বামী-সন্তানদের খুনের হুমকি দেওয়া। প্রাণ বাঁচাতে বহু বার ঠিকানা পাল্টাতে হয়েছে তাঁদের। গত ১৭ বছর ধরে এমনকী নিজের ভোট পর্যন্ত দিতে পারেননি বিলকিস ও তাঁর স্বামী।

বিলকিস বানোর এই সাহসী লড়াই হাসি ফুটিয়েছে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মুখে। মুসলিম নারীদের অধিকার রক্ষার কথা বলে সভায় সভায় চোখের জল ফেলেন যে নরেন্দ্র মোদি, তাঁর ভণ্ডামির দিকে ধিক্কারের আঙুল তুলেছেন তাঁরা। ভোটে যাওয়ার আগে মায়ের পায়ে প্রণামরত মোদিজির ছবি ছাপা হয় কাগজে কাগজে। অথচ বিলকিসের মতো মায়েদের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে মাথা থেঁতলে মেরেছে যারা, তাদের মাথায় অভয় হস্ত রাখতে তাঁর অসুবিধা হয় না! বিলকিস বানোর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইবেন না কেন নরেন্দ্র মোদি?

শুধুমাত্র অন্য ধর্মের অনুগামী হওয়ার 'অপরাধে' একদল নিরীহ মানুষের দিকে আরেক দলকে খেপিয়ে তুলে লেলিয়ে দেওয়াই মোদির দল বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের 'ধর্ম'। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করাই তাদের কৌশল।

গত পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনে এর অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে এ দেশের মানুষ। বিলকিস বানোর ঘটনা এই অপশক্তিকে চিনে নেওয়ার আরও একটা সুযোগ এনে দিল। দেখিয়ে দিয়ে গেল, সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে গেলে লড়াই ছাড়া পথ নেই। এক বিলকিস বানোর লড়াই অনুপ্রেরণা দিয়ে গেল ২০০২-এর গুজরাট তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত, বহু কিছু হারিয়ে ফেলা অসহায় হাজারো সুবিচারপ্রার্থীদের।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের হালতু কায়স্থপাড়া অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড অরুণ সরকার ১২ এপ্রিল নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ১৯৬৪-'৬৫ সালে যে কয়েকজন তরুণ কর্মী হালতু-কসবা অঞ্চলে দলের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন প্রয়াত কমরেড অরুণ সরকার তাঁদের সামনের সারিতে ছিলেন। এলাকায় ছাত্র এবং যুব আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে দলের শক্তিবৃদ্ধিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমাজকর্মী, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে তাঁর সবিশেষ পরিচিতি ছিল। তিনি দীর্ঘ সময় হালতু তরুণ সংঘ ও হালতু সাধারণ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এস ইউ সি আই (সি) কসবা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সংঘের পার্শ্ববর্তী একটি নির্মীয়মান বাড়িতে ২১ এপ্রিল স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন তাঁর শৈশবের বন্ধু দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন পালিত, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কমরেড অরুণ সরকার লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার ইটখোলা অঞ্চলের গোলাবাড়ির কমরেড কালিপদ সরদার বয়সজনিত রোগে নিজ গৃহে ২৮ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ষাটের দশকের শেষের দিকে ভাগচাষি আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা প্রয়াত কমরেড আমিনুদ্দিন আখন্দের নেতৃত্বে তিনি দলের কৃষক খেতমজুর সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। কমরেড কালিপদ সরদার কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বহু মিথ্যা কেসে হাজতবাস করেন। কিন্তু কিছুই তাঁর দলের প্রতি ভালবাসায় আঘাত করতে পারেনি।

কমরেড কালিপদ সরদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম’

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলেন নদীয়ার চাকদা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। দলের নাম শুনেই ‘আসুন আসুন’ বলে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন এক মহিলা। পরিচয় করালেন প্রবীণ এক মানুষের সঙ্গে— ওঁর বাবা। সাগ্রহে তিনি বললেন, আপনাদের জন্যই তো কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি! আমি দীর্ঘদিন সিপিএম করেছি। দল যে এভাবে বিজেপিকে ভোট করাবে এ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ভুল নেতৃত্বের জন্যই দলের আজ এই পরিণতি। আপনাদের অনেক দিন ধরেই দেখছি। আপনারাই পারবেন বামপন্থাকে সঠিক দিশা দিতে। কমরেড প্রভাস ঘোষের ‘জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’ বইটি নিলেন, চাঁদা দিলেন এবং আবার আসার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন। ওই এলাকায় সিপিএম-বিজেপির এক হওয়ার কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। যাঁরা মনেপ্রাণে বামপন্থী তাঁরা নেতৃত্বের এই অবাম আত্মঘাতী নীতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

তেমনই একজন প্রাক্তন শিক্ষক কর্মীদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনারা কি জানেন কত মানুষ আপনাদের ভালবাসে? কত মানুষ আপনাদের পিছনে আছে? বললেন, সারা জীবন বামপন্থী রাজনীতি করে এসে এক চরম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমর্থন করার কথা ভাবতেও পারছি না। চাঁদা দিয়ে বললেন, আমার মতো অনেকেই আছেন, তাঁদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমি যতজনকে পারব বলব। দলের কর্মীরা যখন ওই এলাকায় প্রার্থীর চিহ্ন টর্চের ছবি দেওয়া পোস্টার মারছেন, তখন তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ। বললেন, আপনারা এবার কী চিহ্ন পান সেটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

‘বামপন্থী তো আপনারাই’

আসামের বরপেটা কেন্দ্র। সিপিএম সেখানে প্রার্থী দেয়নি। সেখানে তাদের দলের নেতারা একাধিক জনসভা করে বলেছেন, এই কেন্দ্রে কোনও বামপন্থী প্রার্থী নেই, তাই সব ভোট কংগ্রেসকে দিতে হবে। এমনই একটি জনসভার কিছুক্ষণ বাদেই সেখানে পৌঁছে গেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী হুসনেজাহা বেগমের (ইনা হুসেন) প্রচার মিছিল। এলাকার সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা অবাক— নেতারা তাহলে ডাহা একটি মিথ্যা বলে গেলেন? পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন তাঁদের অনেকেই। আপনারা ভোটে আছেন, তাও বলল এখানে কোনও বামপন্থী প্রার্থী নেই। বলে গেল কংগ্রেসকে ভোট দিতে! এই নির্দেশ মানা যায় না। আমরা আপনাদেরই ভোট দেব। বামপন্থী তো আপনারাই। ভোটের পরেও বেশ কিছু সিপিএম সমর্থক স্থানীয় এসইউসিআই (সি) কর্মীদের বলে গেছেন, ভোটটা আপনাদেরই দিয়েছি। এবারে নেতাদের ধরব, কেন মিথ্যা বলল তার জবাব চাইব।

শিলচরে সিপিএম জেলা সম্পাদক নিজে একাধিক জনসভা করে প্রচার করেছেন, এসইউসিআই (সি)-কে নয়, ভোট দিন কংগ্রেসকে। ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন বহু সিপিএম সমর্থক সৎ মানুষ। প্রকাশ্যে বলে গেছেন তাঁরা, ‘কোনও দিন ভাবিনি যে, নিজেরা প্রার্থী না দিয়ে সিপিএম এভাবে কংগ্রেসের প্রচারকে পরিণত হবে!’ তাই শিলচর কেন্দ্র জুড়ে সিপিএম সমর্থকদের মুখে মুখে ছড়িয়েছে, ‘কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারব না, বামপন্থার মর্যাদা রাখল এসইউসিআই, ভোটটা ওরাই পাবে’।

‘ভেবেছিলাম বিজেপিকে ভোট দেব, বইটা পড়ে সম্বিত ফিরল’

দলের এক কর্মীর কাছে হঠাৎ তাঁর ছাত্রীর ফোন। ‘স্যার খুব ব্যস্ত? মা আপনার সাথে কথা বলবেন।’

‘স্যার বইটা পড়েছি। নতুন অনেক কিছু জানলাম। খুব ভাল লাগল। আপনাদের পার্টির এত ভাল ভাল কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। অন্য দলগুলির উপর বিরক্ত হয়ে এবার ভেবেছিলাম বিজেপিকে ভোট দেব। কিন্তু আর তো বিজেপিকে ভোট দিতে পারব না।’ কর্মীটি প্রশ্ন করলেন, ‘কেন দিদি?’ তিনি বললেন, ‘বইটা পড়ে বিজেপির রাজনীতিটাও ধরতে পারলাম। আপনাদের দলের চিহ্ন কী জানাবেন।’ রাতেই ফোন করে চিহ্নটা জানিয়ে দিলেন তিনি। ছাত্রীর বাড়ি রানাঘাট লোকসভায়। কলকাতায় আসে পড়তে। ছাত্রীকে বইটি দিয়ে কর্মীটি বলেছিলেন, ‘তুমি পড়ে মাকেও পড়তে দেবে। পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলবে।’ বই পড়ার পর তিনি গণআন্দোলনের পক্ষে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘ভোটের পরে আসুন, আলোচনায় বসব’

ভোটে প্রচারের সময় হাওড়ার একটি জায়গায় দশ-বারো জন যুবকের একটি গ্রুপ দলের এক সংগঠককে বললেন, ‘আমরা দীর্ঘ দিনের বামপন্থী। কিন্তু দল যা করছে তা কিছুতেই মানতে পারছি না। এবার ভোটে কোনও কাজ করিনি। দলের এমন দুরবস্থা, কেন কাজ করছি না সেটাও কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। আপনাদের লড়াই আন্দোলন আমরা সমর্থন করি। প্রভাসবাবুর বইটি পড়েছি। ভালো লেগেছে। ভোটের পরে আসুন আলোচনায় বসব। আমরা এখানে কাজ করতে চাই।’

আইনজীবীদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদ

আইনজীবীদের সংগঠন লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার ২৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেছে, ২৪ এপ্রিল হাওড়া কোর্টের আইনজীবী ও হাওড়া কর্পোরেশনের কর্মীদের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে পুলিশের উচ্চস্তরের আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ যে নজিরবিহীনভাবে বহু আইনজীবী, ল-ক্লার্ক ও সাধারণ মানুষের উপর লাঠিচার্জ করে তাতে সাধারণ মানুষ সহ আইনজগৎ স্তম্ভিত। মহিলা আইনজীবী সহ বহু আইনজীবী ও ল-ক্লার্ককে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। কোর্টে বিচারকরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কার নির্দেশে পুলিশ ও র‍্যাফ নির্মমভাবে লাঠি চালাল এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করল তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পরদিন লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের এক প্রতিনিধি দল হাওড়া কোর্টের আইনজীবীদের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের সাথে থাকার অঙ্গীকার করেন। সংগঠনের সভাপতি ও সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত বলেন, ‘এই পুলিশি অত্যাচারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে’। সংগঠনের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলী বলেন, আইনজীবীদের উপর পুলিশের এই ন্যক্কারজনক, নজিরবিহীন আক্রমণের দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তিনি রাজ্যের সমস্ত স্তরের আইনজীবী এবং ল-ক্লার্কদের হাওড়া কোর্টের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী এক প্রতিবাদ মিছিল এবং রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার দাবি করেন।

সংগঠন দাবি করে, ঘটনার উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, হাওড়া কোর্ট সহ রাজ্যের সমস্ত কোর্টের সকল আইনজীবীদের বসার ব্যবস্থা, গাড়ি রাখার সুব্যবস্থা সহ কোর্টের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মিছিল চন্দননগরে

২১ এপ্রিল চন্দননগরে শতাধিক মানুষ যোগ দিলেন মিছিলে। সমস্ত চিটফান্ডের আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে ফেরত, দোষীদের শাস্তি ও এজেন্টদের নিরাপত্তার দাবি তুললেন তাঁরা। মিছিল শেষে বৃষ্টির মধ্যেও এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা সম্পাদক অমিতা বাগ ও রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী।

তাঁরা বলেন, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে বাধ্য করতে হবে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে। চিটফান্ডের মতো গুরুতর জীবনমরণ সমস্যাকে ২০১৪ সাল থেকে ইস্যু বানিয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো অসহায় আমানতকারীদের দাবার চালের মতোই ক্ষমতায় যাওয়ার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু মূল সমস্যা অর্থাৎ প্রতারিতদের টাকা ফেরত এবং এজেন্টদের আত্মহত্যা আটকানোর কোনও বাস্তবোচিত পথের সন্ধান কেউ করছেন না। আদালত টাকা ফেরতের রায় দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই তা কার্যকর করছে না। বিভিন্ন চিটফান্ড কোম্পানির কৃতকর্মের দায় সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রী-আমলারা চিটফান্ড থেকে যে বিপুল পরিমাণে টাকা কামিয়েছেন তা জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তদন্তের নামে দুই সরকারের মধে দড়ি টানাটানি দেখে বহু এজেন্ট-আমানতকারী আজ হতাশাগ্রস্ত। ইতিমধ্যে তিন শতাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। পরিস্থিতি খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নেতৃবৃন্দ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন, যা আমানতকারী ও এজেন্টদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com